Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দুর্ভিক্ষ-চিত্র

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গীতারানী কর্মকার
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.8
Pages	136-148
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দুর্ভিক্ষ-চিত্র

ড. গীতারানী কর্মকার*

বাঙলা তের শ' পঞ্চাশ সালের মহা দুর্ভিক্ষকে অবলম্বন করে কথা সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্প, উপন্যাস ও নাটক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিল্পস্রষ্টাদেরই একজন। লেখক-জীবনের প্রথমাবধি তিনি ছিলেন মানস-সন্ধানী। মানুষকে তিনি বিশ্লেষণ করতেন অন্তর্জীবনের নিরিখে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের অনুসারী। বহির্জীবন বর্জনীয় না হলেও সেটি তাঁর একমাত্র কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষ তাঁর মনে আঘাত দিল প্রচণ্ডভাবে। তিনি দেখতে পেলেন — পৃথিবী যেন পরিবর্তিত হচ্ছে অতি দ্রুত ; কোন মানসিক বৈকল্য নয়, শুধু ক্ষুধার জন্যই মানুষ ও মনুষ্যত্ব ধ্বংস হতে পারে। আসলে মানুষের প্রাণ হচ্ছে অন্নগত। খাদ্যের অভাবে দেহের মাংস, মজ্জা, শোণিত যদি শুকিয়ে যায়, তখন মনের ক্রিয়ার তো টিঁকে থাকা অসাধ্য। কঠিন বাস্তবের এই অনুভূতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার মোড় ঘুরিয়ে দেয় একটা নতুন দিকে। দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মানুষের অনিবার্য জৈবিক চাহিদার রূঢ় বাস্তবতা যেন অপ্রতিরোধ্যভাবে তাঁর লেখায় প্রবেশ করলো। তাই ঐ সময়কে কেন্দ্র করে রচিত গল্পসমূহে দেখা গেল তাঁর নতুন চিন্তার প্রকাশ।

আধুনিক যুগের বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ছবি প্রথম তুলে ধরেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে' ঐতিহাসিক পটভূমির সত্যাসত্য বিশ্লেষণ যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেখানে অঙ্কিত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র ছবিটি। চিরকালের শোষণের দেশ বাঙলায় খাদ্যাভাবে মৃত্যুর আতঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় বর্তমান কালেও যেন জীবন্ত :

> '১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল— লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপের পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে

---

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ

কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয় ! —উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল; বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল ; যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।' (আনন্দমঠ)

যে দুর্ভিক্ষের ছবিটি এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, তা ভয়াবহ। এই দুর্ভিক্ষে বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ইংরেজের রাজত্ব বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপেই দেখা দেয় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বাঙলার রাজনৈতিক সঙ্কট-মুহূর্তে এই দুর্ভিক্ষের আঘাত বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেকখানি। সে সময়কার বিপর্যস্ত বাঙালী সমাজে পড়েছে এই দুর্ভিক্ষের অশুভ প্রভাব। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলার শাসনকর্মে সূচিত হয় বিশৃঙ্খলার পর্ব। মীর জাফরের নিন্দিত শাসন দিয়ে এই বিশৃঙ্খলার সূচনা। পরিণামে এলো ১৭৬৫ সালের 'দ্বৈত-শাসন'। 'দ্বৈত-শাসন' ব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ হলো তীব্রতর, কিন্তু তাতে দেশবাসীর কোনপ্রকার কল্যাণই সাধিত হলো না ; শাসকশক্তির দু'পক্ষের অবহেলা, অযোগ্যতা ও অর্থলিপ্সার জন্যে এ-সময়ে বাঙলায় দেখা দিল সার্বিক দুরবস্থা।

দ্বৈত-শাসনের পর এলো ইংরেজের 'পাঁচ সালা' ও 'দশ সালা' পরিকল্পনা। এগুলো সবই ছিল শোষণের প্রকরণমাত্র। আঠারো শতকের সেই সময়ে বাঙলার শাসকশক্তি দেশের জনগণের সুখ-দুঃখের পরিবর্তে বড় করে দেখেছিল নিজেদের স্বার্থ।[১] তাদের লোভ ক্রমে বাড়িয়ে দিচ্ছিল বাঙলার শোষণ। লোভী কোম্পানী এ-সময় হাত দিল খাদ্যশস্যের কেনা-বেচায়। জোর করে চাষীদের ফসল বিক্রি করিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায় করতেও তারা দ্বিধা করেনি।[২] আবার সৈন্যবাহিনীর অনাগত খাদ্যাভাব

ঠেকানোর জন্যে নিরুপায় চাষীদের সমস্ত ফসল কিনে মজুত করতেও ভুল করেনি তারা।[৩] এই মজুত ফসল সংগ্রহ করা হয়েছিল বাঙলার গ্রামীণ এলাকার খাদ্যসঞ্চয় শূন্য করে।[৪] ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নির্লজ্জ কূটকৌশল, শাসকদের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার সঙ্গে যোগ হয়েছিল প্রকৃতির বিরূপতা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগে থেকেই দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে পর পর কয়েক বছর দেখা দিয়েছিল অজন্মা।[৫] তার সঙ্গে মন্বন্তরের সময় আরম্ভ হয়েছিল গুটি বসন্তের মহামারী। আরেক বিপদ হয়ে এলো আকস্মিক অগ্নুৎপাতের ভয়।[৬] আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অনেক শস্যগোলা।

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' এঁকেছেন তাতেও পাঠকের মনে বাস্তব ঘটনার একটা ধারণা জাগে। ঐ সময় খাদ্যের অভাবে মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছে বাঙলার পথে পথে। অখ্যাদ্য, কুখাদ্য কিছুই খেতে তারা বাকি রাখে নি। দুর্ভিক্ষে দিশেহারা মানুষ পুত্র, কন্যা, স্ত্রী পর্যন্ত বিক্রি করেছে। এমনকি আত্মবিক্রয়ের ঘটনাও ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের বিস্তার পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলার চেয়ে পশ্চিম ও উত্তর বাঙলাতেই হয়েছিল বেশি। বাঙলার পশ্চিম ও উত্তর অংশের প্রায় গ্রামই জনশূন্য হয়ে ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[৭] এদের মধ্যে কিছু লোক মারা গিয়েছিল ; আর কিছু লোক স্থান ত্যাগ করে এসেছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পূর্ব বাঙলায়। শেষ পর্যন্ত গোটা বাঙলায় সব চেয়ে বেশি অভাব হলো মানুষের। এভাবে সমগ্র বাঙলায় প্রসারিত হয়েছিল একটা আতঙ্কের কালো ছায়া। কিন্তু এত বড় দুর্যোগেও শাসকশক্তির মন টলেনি।

এখানে একটি লক্ষযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলেই ইংরেজ রাজত্ব বাঙলায় শক্ত হয়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা বাঙলায় বাণিজ্যের তুলনায় রাজ্য স্থাপনের প্রতিই করেছিল অধিক মনোনিবেশ। তাদের সেই লোভী প্রয়াসের ফলেই এল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এই ছিদ্রপথে ইংরেজ রাজশক্তিও যেন খুঁজে পেল তাদের বিবেকহীন শোষণের পথ। শক্ত হয়ে পরদেশে রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে তারা প্রণয়ন করলো 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রথা। সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সৃষ্টিতে প্রকৃতির চেয়ে অধিক দায়ী মানুষ।[৮] মানুষের স্বার্থবুদ্ধির জন্যেই ঘটেছে 'বঙ্গদেশে এক কোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারীর মৃত্যু।'[৯]

'আনন্দমঠের' উদ্ধৃতাংশটিতে ঔপন্যাসিকের বাস্তব বর্ণনায় আছে পর পর কয়েক বছরের অজন্মা, অনাবৃষ্টির সঙ্গে শাসকশক্তির লোভের চিত্র। সেই আঠারো শতকের বাঙলার মানুষের যে দুর্দশার ভয়াবহ ছবি লেখক এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসটিতে, তা অনুভব করলে যেন এক মুহূর্তে পাঠকের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে পড়ে। সে দিনের

রাজ্যলোভী ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সহযোগীদের নির্মমতার চিত্র বাঙলা কথাসাহিত্যে সংযোজন করেছে একটি নতুন ধারা। শিল্প-সৌন্দর্যের সমান্তরালে এই নতুন ধারাটিতে যুক্ত হয়েছে কঠোর নগ্ন বাস্তব তথ্যের উপস্থাপন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দীর্ঘকাল পরে ১৯৪৩ সালে বাঙলায় আবার দেখা দিল ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ঘটেছিল বাঙলা ১১৭৬ সাল বা ইংরেজী ১৭৭০ সালে। দ্বিতীয় ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ঘটনাকাল হচ্ছে বাঙলা ১৩৫০ সাল। এটি বিখ্যাত হয়েছে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাঙলায় ছোট-খাট খাদ্যাভাব যে কখনো হয়নি তা নয়। তবে বাঙলা তেরশ' পঞ্চাশ সালের এই দুর্ভিক্ষ বাঙলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিস্তার করে সুদূর প্রসারী প্রভাব। বিদেশী শাসনাধীন ভারত তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি। শাসকশক্তির প্রয়োজনে ভারতকে ঘোষণা করা হয়েছে 'যুদ্ধরত দেশ' হিসেবে। এ সময় দেশীয় জনজীবন যুদ্ধের প্রভাবমুক্ত থাকেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচিত হয় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এর কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৪৩ সালে যুদ্ধভীত বাঙলায় দেখা দেয় ব্যাপক খাদ্যাভাব। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজাত পরিস্থিতিতে বস্ত্র, ঔষধ, জ্বালানী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা। ফলে, বাঙলার জনজীবনে নেমে আসে দুঃসহ দুর্যোগ। ১৯৪৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে এঁর সূচনা হয়েছিল বেশ আগে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময়ই বাঙলায় দেখা গিয়েছিল খাদ্যাভাব। এই দুর্যোগের রেশ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে 'বিশ্ব-আর্থিক-মন্দা'র প্রভাব এসে পড়ে বাঙলার সমাজ-জীবনে। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৪০-৪১ সালের দিকে দেশে দেখা দেয় অজন্মা। পরের বছর ১৯৪২ সালে আমন ভাল হলেও আগের বছরের ঘাটতি পূরণ করে ভবিষ্যতের সঞ্চয় রাখা ছিল অসম্ভব।[১০] এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াজাত খাদ্যাভাবের বিষয়টি তুচ্ছ নয়।

বিপর্যয়ের প্রতিটি ধাপ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলো ১৯৪৩ সালে এসে। গোটা পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক। ঔপনিবেশিক সরকারের প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে 'যুদ্ধরত দেশ' ঘোষণা করার পর দেশের নিরপেক্ষ শান্ত ভাবটি আর স্থিতিশীল হলো না। যুদ্ধের বিস্তৃতির ফলে এক পর্যায়ে তৎকালীন ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এসে পড়ে জাপানী সেনাবাহিনী। জাপানীদের সম্ভাব্য আক্রমণের আতঙ্কে ভারতের পূর্ব প্রান্তে আসাম ও বাঙলায় গ্রহণ করা হলো কতকগুলো জরুরি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলোর অন্যতম হলো আন্তঃজেলা পর্যায়ে খাদ্য পরিবহন নিষিদ্ধকরণ। কিন্তু দেশে তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করার লক্ষ্যে পূর্বাঞ্চলের সকল নৌকা সরকার কর্তৃক 'সীজ' করা হয়। ফলে, দেশের হাটে-বাজারে ধান, চাল বা অন্যান্য শস্য

পরিবহন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আবার, অধিক পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের আশঙ্কায় মজুত করে রাখে বিশাল পরিমাণে ধান ও চাল।

সরকারও যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য খাদ্যশস্য মজুত করে রাখে। এ-সময় দেখা দেয় শাসনকার্যে অব্যবস্থাপনা। সে সময় খাদ্যসঙ্কট সত্ত্বেও বাঙলার বাইরে থেকে কোন খাদ্য নিয়ে আসা হয়নি। ব্রহ্মদেশ থেকে চাল এনে বাঙলার খাদ্যাভাব পূরণ করা হতো। তৎকালীন সরকার সে-সময় এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সিংহলের ভারতীয় কুলি ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যে চাল রপ্তানি বন্ধ করা হয়নি।[১১] বস্তুত, তৎকালীন সরকারের এবং কিছু সুবিধাভোগী, লোভী মানুষের স্বার্থে ও কৌশলে বাঙলায় নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ পঞ্চাশের মন্বন্তরের শিকারে পরিণত হয়নি। প্রধানত গ্রামের চাষী-মজুর প্রভৃতি স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রেণী নেমে এসেছিল ভিক্ষুকের পর্যায়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা হয়েছিল দরিদ্র। পক্ষান্তরে, দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে এই দুর্ভিক্ষ বিশেষ আঘাত করতে পারে নি। বরং যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের মিলিত পরিস্থিতিতে এই শ্রেণীর অনেকেই সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে।[১২] দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উত্থান-পতন বাঙালী সমাজে বিশেষ পরিবর্তন ঘটায়। পারিবারিক কাঠামোতেও এই মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন। সাধারণ পরিবারগুলোর ভবিষ্যতের সম্বল ভূ-সম্পত্তি আর সঞ্চিত সোনা প্রকারান্তরে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। সমাজ-জীবনে ভূ-সম্পত্তি ও সোনা হচ্ছে পারিবারিক নিরাপত্তার ও অভিজাত্যের ভিত্তি। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ বাঙালীর সামাজিক শৃঙ্খলার মূল ধরে নাড়া দেয়। যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাঙালীর সামাজিক জীবনে বিপর্যয় হয়ে ওঠে অনিবার্য। গ্রামীণ সামাজের কাঠামোতে এ-আঘাত লাগে তীব্রভাবে। কারণ কলকাতা ও অন্যান্য শহরে যুদ্ধকালীন কিছু তাৎক্ষণিক আয়ের উৎস খুলে যায়। ফলে, সেখানে অনেকের খুব একটা অর্থাভাব দেখা দেয়নি। কিন্তু গ্রামের প্রাচীন রীতিবদ্ধ সমাজকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।[১৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণ সন্ত্রস্ত, ঠিক তখনই ভারতীয় রাজনীতির পরিস্থিতিও হয়ে উঠেছিল জটিল। ইংরেজ সরকারের যুদ্ধে যোগদানের ফলে, স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধব্যয় বহনের দায়িত্ব এসে পড়ে ভারতের ওপর। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' যোগ দেয় ব্রিটিশ-বিরোধী জাপানের সঙ্গে।

অধিকন্তু, ব্রিটিশ-বিরোধী নাৎসী সমর-নায়ক হিটলারকেও 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' জানাল সমর্থন। দেশের এই জটিল অবস্থায় অনাহারে পশুর মত মৃত্যুবরণ করল

বাঙলার নিরুপায় মানুষ। এই দুর্ভিক্ষে বাঙলা ও বাঙালীকে যে কঠিন মূল্য দিতে হলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহু লেখকের গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি বিচার্য :

> Starvation and diseases imposed a heavy toll of physical suffering and mortality upon Bengalis, but these were not the only costs. The preoccupation with subsistance and survival among poor peasant and imprecarious middle-class families meant that many ordinary religious, educational and social activites were nelected.[১৪]

সার্বিকভাবে এই দুর্ভিক্ষ ছিল 'মনুষ্য-সৃষ্ট,'[১৫] প্রাকৃতিক নয়। দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত এই সমাজের বিবিধ বিপর্যয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় প্রতিফলিত হলো তাঁর সাহিত্যচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে। সাহিত্যজীবনের সূচনাকালে মানুষের প্রতি ছিল তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টিপাত। কিন্তু জীবনের একটা বিশেষ সময়ে পৌঁছে তাঁর এ-দৃষ্টি হলো পরিবর্তিত। এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর অনুভূতিতে তীব্র হয়ে উঠলো মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতার দিক পরিবর্তনের সেই বিশেষ ক্রান্তিলগ্নটি হচ্ছে ১৯৪৩ সাল। তাঁর এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো সে সময় রচিত কিছু শিল্পকর্মে — বিশেষ করে ছোটগল্পে। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত নিরাসক্ত আলোকচিত্রের মত এই গল্পগুলোর কিছু সংখ্যক প্রথম গ্রথিত হলো 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামে। এই সঙ্কলনটি বেরোয় ১৯৪৬ সালে। দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্ন তখন অতিক্রান্ত হলেও তার স্মৃতি ছিল অম্লান। গ্রন্থের নাম গল্পটিতে দুর্ভিক্ষের এই স্মৃতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে উজ্জ্বল বর্ণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে আরও অনেক লেখক তাঁদের কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন দুর্ভিক্ষের চিত্রটি। এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ-প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য। তিরিশের দশকের এই লেখকত্রয়ী প্রায় কাছাকাছি সময়ে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কে ধারণ করেছেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে। ফলে, কোন না কোনভাবে দুর্ভিক্ষ প্রবিষ্ট হয়েছে তাঁদের শিল্পকর্মে। এ-সময়েই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'মন্বন্তর'। 'মন্বন্তর' দুর্ভিক্ষ-কালীন সময়কে ধারণ করেছে উপন্যাসের কাহিনীতে ; কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অতি ক্ষীণ। সেটি এ উপন্যাসে এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। সমগ্র উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষের এমন কোন প্রাধান্য নেই যা কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।[১৬] এ উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ যে যুদ্ধসৃষ্ট পরিস্থিতি — বর্ণিত হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া মানুষকে আক্রান্ত করেছে সামাজিক এবং মানসিক দুদিক থেকেই। এ কারণেই উপন্যাসের কাহিনীতে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিরই শৈল্পিক উপস্থাপনা লেখক ঘটিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় পীড়িত একটি সামন্ত

পরিবারের মর্মান্তিক পরিণামে। তবে সমকালের যে প্রেক্ষাপট কাহিনীকে ধারণ করেছে, তার অনুষঙ্গে এসেছে দুর্ভিক্ষের পরিবেশ বর্ণনা। যেমন নিচের অংশ :

> ...'কানাই বুঝতে পারলে পল্লীগ্রামের নিরন্ন মানুষের দল অন্নের আশায় বোমার আতঙ্ক মাথায় করেও মহানগরীতে এসেছে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে। মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ এ সব স্থানের অন্নাভাবের কথা, সারা দেশের ... অবস্থাই ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে আসছে। জুয়াখেলার আসর বসে গেছে ধান চালের বাজারে। দিন দিন দর চড়িয়ে যাচ্ছে। মহাজনেরা দ্বিগুণিত দান ধরায় যেন উন্মাদ। চাষী আর কতক্ষণ ধরে রাখবে তার ঘরে ? যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য করে তোলে মানুষ।' (মন্বন্তর)

উদ্ধৃত অংশটিতে বর্ণিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। তবে এ-উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের অনুভূতি সীমিত রয়েছে শুধু বর্ণনাতে ; উপন্যাসের চরিত্রের জীবনের সঙ্গে এ-অনুভূতি একান্ত করে দেওয়ার চিন্তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় করেননি। সমগ্র উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষ তাঁর মনোযোগের বিষয় নয়। তাঁর এই উপন্যাসে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে দুর্ভিক্ষ এসেছে অনুষঙ্গ হয়ে। তিনি বরং কাহিনীতে আভাস দিয়েছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক কোন ঘটনা নয় ; আসলে এটা পুরোপুরি মনুষ্যসৃষ্ট। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গ প্রাধান্য না পেলেও অনাহারে মৃত্যুর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা পাঠক চিত্তকে নাড়া দেয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের নাম 'মন্বন্তর' রেখেছেন আক্ষরিক অর্থে নয়, ভাবার্থে। তাঁর চেতনায় এই মন্বন্তরের বোধ এসেছে উপন্যাসের কিছু চরিত্রের আদর্শচ্যুতির ফলে। সে সময়ের বাঙলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যেন দ্রুততর করে তুলেছিল মনুষ্যত্বের বিনষ্টি। তাই লেখকের দৃষ্টিতে মন্বন্তর দেখা দিয়েছে মানবতার অপমৃত্যুতে । এ মন্বন্তর প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের নয় — চিরন্তন মানসিক জীবনের। এ মন্বন্তরের আঘাত এসেছে মূলত নীলা আর কানাইয়ের জীবনে। গোটা বাঙলার মন্বন্তর এ উপন্যাসে গৌণ বিষয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মন্বন্তর' প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অশনি-সঙ্কেত' লক্ষ্যযোগ্য। এ-উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গই হলো মন্বন্তর। তের শ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ব্যাপক বিস্তৃতি যেন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে উপন্যাসটির সমগ্র অবয়বে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি রচনাও করেছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।[১৭] 'অশনি-সঙ্কেতে'র কাহিনী রচিত হয়েছে বাঙালী সমাজের একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়ের প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটি দরিদ্র পরিবার। কাহিনীর সূচনাতে পাঠক পরিচিত হয় একটি শান্ত, মধুর গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক প্রসারিত হয় গোটা কাহিনীতে। এ-প্রসঙ্গে 'অশনি-সঙ্কেতে'র কিছু কিছু অংশ লক্ষ্যযোগ্য। একটি অংশে দেখা যাচ্ছে —

> ...'শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ -- যে এত আশাবাদী, সে পর্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ যেন কর্পূরের মত দেশ থেকে উবে গেল কোথায়। এক দানা চাল কোথাও পাওয়া যায় না। এত বড় গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল, খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে ফিরে যাচ্ছে চাল অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েছে হাটে হাটে ; কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতো বালির বস্তার দেওয়ালের মত, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ। পথে ঘাটে ক্রমশ ভিখিরীর ভিড় বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, এরা এতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এ দেশের লোকও নয় এরা, বিদেশী ভিখিরী, একদিন অনঙ্গে-বৌ রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্দ্ধউলঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালিকা — ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল — ফ্যান খাইতাম — ফ্যান খাইতাম — ...' (অশনি-সঙ্কেত)

দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহ সূচনাকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে বিস্তৃত করে দিয়েছেন উপন্যাসের তথা জীবনের সর্বত্র। ফলে, মন্বন্তর শুধু একটি ঘটনামাত্র হয়ে থাকেনি তাঁর উপন্যাসে — মর্মে যেন আঘাত দেয় তাঁর নিরাসক্ত বর্ণনা। যেমন আর একটি চিত্র :

> ...'ক্ষ্যান্তমণি পান আনতে গেল, পাতে দুটি ভাত পড়ে আছে — গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হোল ভাত দুটি সে বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে ? চাদরের মুড়োয় বেঁধে? ছিঃ — সবাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাঁদরের মুড়োয় বেঁধে-নেবে ?
>
> গঙ্গাচরণ বসে বসে ভাবতে লাগলো। কি করা যাবে ? বলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাড়ি একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো। তাতে সে কি মনে করবে ? বড় লজ্জা করে যে। অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবু চার-পাঁচ গ্রাস ভাত হবে অনঙ্গ-বৌয়ের। বড় বড় চার-পাঁচ গ্রাস। নিয়ে যাবেই সে ! কিসের লজ্জা ?'... (অশনি-সঙ্কেত)

এই চিত্রটির সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণিত মন্বন্তরের ছবিকে এক পংক্তিতে রাখা যায় না। কারণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বর্ণনায় অনুভূতির সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা মিশে বেদনাবোধ তীব্র করে তুলেছে। 'অশনি-সঙ্কেত' থেকে উদ্ধৃত অংশ দুটির প্রথমটি যদিও বা সাধারণ বর্ণনা বলা যায়, দ্বিতীয়টি তা নয়। মাত্র তেরটি ছোট বড় বাক্যে ফুটে উঠেছে একটি মর্মান্তিক চিত্র। এ চিত্রে বর্ণনার স্থান অধিকার করেছে জীবনের প্রবল তৃষ্ণা। মন্বন্তরের এই চিত্রাঙ্কনের প্রয়াসের মধ্যেই আভাসিত হয়েছে লেখকের আন্তরিকতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের দুর্ভিক্ষ চিত্রগুলোও এই পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটি। গল্পের কাহিনী মুখ্যত গড়ে উঠেছে

মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রামীণ পরিবারগুলোর বিপর্যয় নিয়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের একটি লজ্জাকর ও দুঃখজনক দিক হচ্ছে নারীব্যবসায়ী দালালদের তৎপরতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সমাজের এই নীচতা ছিল দুঃসহ। তাঁর দুর্ভিক্ষ-সম্পৃক্ত গল্পগুলোতে বার বার উপস্থাপিত হয়েছে নারী ব্যবসায়ের বিভিন্ন চিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশী সৈনিকদের বাঙলায় উপস্থিতি দেশীয় সমাজে সৃষ্টি করেছিল আকস্মিক বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতির সুযোগে দেশের এক শ্রেণীর মানুষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়াসে। স্বার্থের জন্য যে কোন হীন পন্থা অবলম্বনে তাদের দ্বিধা ছিল না। ফলে, সমাজের কিছু নিরুপায় মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল অতল অন্ধকারে। 'আজ কাল পরশুর গল্প' দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় নারী ব্যবসায়ের কাহিনী যা গড়ে উঠেছে রামপদ আর মুক্তার দাম্পত্য জীবন নিয়ে। দুর্ভিক্ষ চূর্ণ করে দিয়েছে তাদের শান্তির সংসার। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় রামপদ নিখোঁজ হয়ে গেলে মুক্তার ঠাঁই হয় মহকুমা শহরের পতিতালয়ে। সেখানে গ্রামের আরেক প্রতিবেশিনী গিরির সঙ্গে দেখা হয় তার। দু'জনেই হয়েছে একই দালাল ঘনশ্যামের শিকার। এই গল্পটির বিশেষ দিকটি হচ্ছে দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের মানুষ। সাধারণের দৃষ্টিতে গ্রামের মানুষ হচ্ছে সরল ও নির্বিরোধ এবং গ্রামের সমাজ হচ্ছে নির্ঝঞ্ঝাট ও প্রীতিপ্রদ। এই জানাটা আসলে সবটুকু জানা নয়। এই অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে যায় আরও অনেক আজানা তথ্য। সরল দৃষ্টিতে গ্রামীণ সমাজের সমান্তরালে নাগরিক বাঙালী সমাজকে মনে হয় পারস্পরিক যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। জীবন ধারণের কঠিন চাপ নাগরিক মানুষকে ঘনিষ্ট হওয়ার মত সুযোগ দেয় কম। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে নিঃসঙ্গ ভাবটি অনুপস্থিত। ফলে, যেমন পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি, তেমনি পাওয়া যায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধিতা ; পরিমাণে সম্ভবত শেষেরটিই গুরুভার। বিরুদ্ধাচরণে গ্রামীণ সমাজপতিরা স্বভাবতই দক্ষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু শিল্পকর্মে চিত্রিত হয়েছে বাঙালী সমাজের এই বৈষম্যটি। 'আজ কাল পরশুর গল্প'-ও এই শ্রেণীর।

গৃহবধূ মুক্তাকে রারবণিতায় পরিণত করেছে সমাজপতি ঘনশ্যাম। এই ঘনশ্যামই সমাজের পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়ে তার স্বামী রামপদকে সমাজচ্যুতির ভয় দেখায়। কিন্তু ঘনশ্যাম নিজেই মুক্তার পতনের জন্য দায়ী। মুক্তার ঘরে ফেরা ঘনমশ্যামের মত সমাজপতিদের দৃষ্টিতে অবৈধ। তাদের চক্রান্তে মুক্তার মত মেয়েরা ঘরে ফিরতে বাধা পায়। দুর্ভিক্ষোত্তর বাঙলায় এই সমস্যা প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল সমাজের বহু রন্ধ্রে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী মন এই চক্রান্তের স্বীকৃতি দিতে পারে নি। তাঁর ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষে যারা সর্বস্ব হারিয়েছে, তাদের সকলের মনে নীচতা আসেনি। ঘনশ্যামের চক্রান্ত তাই গ্রামবাসীদের সমর্থন পায় নি। এই ঘটনাটির বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে লেখকের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি। তিনি অনুভব করছেন, সমাজে ভাঙন

এসেছে। পুরনো সমাজবিধির অচলায়তনে ফাটল ধরেছে এবং এই ভাঙনের মূলে আছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মানুষের জীবন ধারণের সঙ্কট যখন বাড়িয়ে দেয়, তখন সমাজ-বন্ধনে শৈথিল্য হয়ে ওঠে অনিবার্য। মানুষের মূল্য হারিয়ে যায় ঐ পরিস্থিতিতে। কিন্তু মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের চেতনায় মানুষের মূল্য সর্বাধিক।[১৮] আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার মুক্তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি। তার শারীরিক পবিত্রতার ধারণার তুলনায় জীবন ধারণের সঙ্কট অনেক কঠিন। দুর্ভিক্ষ তার জীবন ধারণের সমস্যাকে করেছে আরও ভয়াবহ। দারিদ্র্যের এই সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ধনিকশ্রেণী কখনো ভুল করে না। তেরশ' পঞ্চাশের বাঙলার এ-ধরনের বহু ঘটনার ছবি আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত 'নমুনা' গল্পটি যেন সমাজ বিধানের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। ধর্মের মূল্য যে অন্নের কাছে কত তুচ্ছ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শুদ্ধাচারী কেশব চক্রবর্তী কিছু খাদ্যশস্যের বিনিময়ে তরুণী কন্যা শৈলকে তুলে দেয় নারী-ব্যবসায়ী কালাচাঁদের হাতে। কিন্তু এই 'তুলে দেওয়া'টা যে কত বড় মর্মান্তিক, তার যন্ত্রণা-পীড়িত বর্ণনা দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা সমাজের ধর্মবিশ্বাস, আজন্মের অভ্যস্ত সংস্কার ও সংস্কৃতির চেতনা, সর্বোপরি পিতৃস্নেহকে অবলীলায় বর্জন করা অতি কঠিন। এই ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি ও মানবিকতার বৃত্তকে যখন মানুষ অস্বীকার করে, তখন তাকে পেরোতে হয় নিজের মনের বিরাট বাধা। কেশব চক্রবর্তীও এই মানসিক বাধা পেরোতে গিয়ে প্রতারণা করেছে নিজের সঙ্গে। তরুণী কন্যা শৈল তার আহার্যের জীবন্ত মূল্য হলেও, এই বিনিময়ের ব্যবসায়ে প্রয়োজন হয়েছিল বিবাহের প্রহসন। শৈলর পিতামাতা জানে সে কালাচাঁদের ব্যবসায়ের উপকরণ হবে ; তবু তারা প্রাণপণে প্রয়াস পেয়েছে অটুট রাখতে তাদের বিশ্বাসের বৃত্ত। কিন্তু মন্বন্তরের কঠিন আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই বৃত্তের দেয়াল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা ছিল শুধু তাদের কল্পনাতে।

দুর্ভিক্ষ-সম্পর্কিত কিছু গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালের মজুতদারী কালোবাজারি প্রভৃতিরও চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'প্রাণের গুদাম', 'পেটব্যথা' 'ধান' তাঁর এই শ্রেণীর গল্প। এ-পর্যায়ের গল্পগুলোতে পূর্বালোচিত গল্পগুলোর মত অনুভবের তীব্রতা হয়তো পাঠককে ততখানি নাড়া দেয় না, তবু সেকালের তথ্যসমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটের জন্যে গল্পগুলো মূল্যহীন নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের নির্মমতা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ করা যায় 'অমানুষিক' গল্পে। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ মানুষ কি ভাবে নেয় তারই ছবি এটি। গল্পটির কাহিনীতে আছে একটি গ্রামীণ পরিবারের কথা। দুর্ভিক্ষ কেমন ভাবে ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে ঘরকে শ্মশান করে, প্রিয় পরিজনকে

পর করে দেয় তারই নির্মম চিত্র এটি। ছিদামের মত হতভাগ্য চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর কোন গল্পে আঁকেননি। তাঁর এই নিরাসক্ত দৃষ্টি চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর তথ্যনিষ্ঠ মনের প্রভাবে।[১৯] অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বাস্তব ঘটনাকে নীতি বা স্বার্থবুদ্ধির কারণে সাহিত্যে প্রকাশ না করাটা তিনি মনে করতেন অন্যায়।[২০] ঐ সময়ে ভীরু ও দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী বধূকে হঠাৎ-বড়লোকদের পক্ষে গ্রাস করার পন্থাটা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল এ রকম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা-কৌশলে 'অমানুষিক' গল্পটি মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয় একটা বিবমিষার অনুভূতি। দুর্ভিক্ষের গ্রাসে নিরুপায় আত্মসমর্পণের ছবি আছে আরও কিছু গল্পে। এ পর্যায়ের গল্প হচ্ছে 'গোপাল শাসমল' 'নেড়ী' 'গলায় দড়ি কেন', 'প্রাণের গুদাম' প্রভৃতি উল্লেখ্য।

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু গল্পে তিনি চিত্রিত করেছেন মানুষের ভিন্নতর একটি পরিচয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকাঙ্ক্ষার রঙে রঞ্জিত সেই ছবিগুলো সাহসী মানুষের। তারা দুর্বল হতে পারে কিন্তু ভীরু নয়। চক্রান্তকারী অশুভ শক্তিকে চিহ্নিত করতে তাদের ভুল হয় না। লেখকের আকাঙ্ক্ষা যেন এ গল্পগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে গল্পের আকারে। তিনি যে নিরুপায় মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেন নি তা-ই যেন ব্যক্ত করেছেন প্রকারান্তরে। 'পেটব্যথা' 'কানাই তাঁতি', 'ধান' প্রভৃতি গল্প তাঁর এ-ভাবনার ছবি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ক্ষুদ্রাকার উপন্যাস 'চিন্তামণি' উল্লেখ্য। 'চিন্তামণি'তে তিনি এঁকেছেন দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে মৃত্যুর প্রতিকূলে দুর্বল মানুষের প্রাণপণ সংগ্রামের চিত্র। এ সংগ্রামে মানুষ কখনো জয়ী হয়, কখনো বা হয় পরাভূত। 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পটি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে, ক্ষুধার পেষণ মানুষের সংগ্রাম-স্পৃহার ক্ষয়ের কারণ।

এ-পর্যন্ত আলোচিত দুর্ভিক্ষ-চিত্রে প্রত্যক্ষ করা গেছে শুধু মানবতার অপমৃত্যু। কিন্তু কিছু গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দন জানিয়েছেন মানবচিত্তের মহৎ প্রতিষ্ঠাকে। 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণ', 'রাসের মেলা', ও 'বেড়া' গল্পের ছবিতে অনুভব করা যায় মানুষের প্রতি লেখকের ভালবাসা। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পের নায়কের নাম 'সন্ন্যাসী'। এ গল্পটিতে লেখক এঁকেছেন একটি অসাধারণ ভালবাসার ছবি। নিজের উপোসকে সন্ন্যাসী মনে করে প্রিয়জনের অনাহারের চেয়ে কম কষ্টদায়ক। এই ভালবাসার শক্তিতে সে সাড়ে সাত সের চাল সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও উপোস করে। আপনজনের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার আশায় সে না খেয়ে চাল কটি বুকে বেঁধে রাখে। কিন্তু তার সে আশা সফল হয় না, বরং উপোসে মারা যায় ঐ নায়ক। 'সন্ন্যাসী' চরিত্রটির মৃত্যু সত্ত্বেও যেন এ-গল্পের কাহিনী মানুষকে শেখায় নতুন করে ভালবাসতে। দুর্ভিক্ষের মধ্যেও যে মানুষের অতলস্পর্শী ভালবাসা নিঃশেষ হয় না তা স্বীকার করতে হয়। 'প্রাণ' গল্পটিতে অটল ও মালতী চরিত্রের মধ্যে বিশ্বস্ততা নতুন করে জাগ্রত করে

মনুষ্যত্বের মহিমা। 'রাসের মেলা' ঠিক দুর্ভিক্ষের গল্প নয়, অল্প কিছু কাল পরের কথা। এ-গল্প হচ্ছে নতুন করে জীবন গড়ার গল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণায়, দুর্ভিক্ষ বা দুর্যোগ কখনো মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়ে তা লুপ্ত করে দিতে পারে না। জীবনের আকাঙ্ক্ষার আসলে বিনষ্টি নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রধান প্রচেষ্টা যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে শিল্পের আধারে সত্যের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যকর্মের বিবিধ পর্যায়ে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজের মূল ধরে নাড়া দেবার মতো এক একটি বিষয়। তাঁর এই প্রবণতা ছোটগল্পে সর্বাধিক প্রবল। গল্পরস পরিবেশন করে পাঠককে মুগ্ধ করা তাই তাঁর উদ্দেশ্য থাকেনি প্রায়শ। সত্যভাষণে সমাজকে সচেতন করাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক গল্পে বর্ণিত চিত্রে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা অতিশয় স্পষ্ট। কথাশিল্পীর অবয়বে যেন এক বেদনার্ত প্রবল সংগ্রামী বিপুল মমতা ও দার্ঢ্য নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন চিত্র রচনায়। ফলে, তাঁর ছোটগল্পে অঙ্কিত দুর্ভিক্ষ-চিত্রকে তথ্যহীন অবাস্তব বলা কষ্টকর। 'আনন্দমঠ' বা 'অশনি-সঙ্কেত' উপন্যাসে শিল্পের আধারে মন্বন্তরের বেদনা রচনা করেছে একটা স্থায়ী পাদপীঠ। এই পর্যায়েই এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের দুর্ভিক্ষ-চিত্রসমূহ। এই গল্পসমূহে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের কাহিনীকে বলা যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক বিশ্বস্ত চিত্রপট। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে এ-চিত্রাঙ্কনে।

তথ্যপঞ্জি :

১. নিখিল সুর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৩

২. ঐ, পৃ. ২০-২১

৩. ঐ, পৃ. ১৬-১৭

৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৬১

৫. নিখিল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৩

৮. ঐ, পৃ. ১১

৯. ঐ, পৃ. ১৪৫

[১০]. B.M. Bhatia, Famines in India, Bombay, 1963, p. 322

[১১]. শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কলকাতা, ১৩৫১, পৃ. ১৬

[১২]. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৪৮

[১৩]. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৩২৯-৩০

[১৪]. Greenough,Paul R., Famine and Misery in Modern Bengal, New York, Oxford, 982, p. 173

[১৫]. R. P. Dutt. India Today, Calcatta, 1979, p. 263, 1963, p. 322

[১৬]. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৫৬১

[১৭]. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৪৮৪

[১৮]. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, মানিক রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৫৫

[১৯]. লেখকের সমস্যা, ঐ, পৃ. ৫৬৭

[২০]. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৩৭